রাধাচরণ।

১৮৫৭ খ্রীঃ মে মাসে পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সাহাজাদ-পুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম ৺রামজয় ঘোষ, মাতার নাম ব্রহ্মময়ী। পিতা মাতা উভয়েই অতি শান্ত প্রকৃতি, সরল, দয়ালু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার যখন ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন হইতেই সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। পিতা মাতা এ অবস্থাতেও ইঁহাকে সাধারণ লেখা পড়া শিখাইতে চেষ্টা করেন। কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা এবং নিজ ও পরিবারের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রাধাচরণের স্বহস্ত লিখিত ডায়েরী হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া উদ্ধৃত হইল।

"পিতা মহাশয় আমাকে আন্দাজ ৯।১০ বৎসর বয়সে লেখা পড়া শিখিতে দেন। এই সময় আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, পাঠ্য পুস্তকাদির জন্য স্থানীয় ভদ্র লোক-দিগের নিকট ভিক্ষা করিতে হইত। ১৫ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বৃত্তি পাইলাম না। অতঃপর পিতা আমাকে অধিক পড়াইবেন

কি, তখন সংসার যাত্রাই অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। তবুও পিতা মহাশয় আমাকে পড়া হইতে ক্ষান্ত করেন নাই। এই সময় পিতা দুরন্ত কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া এক প্রকার শয্যাগত হন। সুতরাং আমাকে সংসারের কার্য্যে মন নিয়োজিত করিতে হইল। কিন্তু পড়া ছাড়িলাম না। অনিচ্ছা পূর্ব্বক ওকালতী পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় অবশেষে মেডকেল স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইল। অনেক চেষ্টায় ৪ বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি মঞ্জুর হইল। এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে ৪৫৲ টাকা ভিক্ষা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। পুস্তকাদি কিনিয়া অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। অভাব হইলেই ঈশ্বর পূর্ণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের চারি টাকার একটী বৃত্তি ছিল, অনেক চেষ্টায় আমি তাহা পাইলাম। এই টাকা হইতে বাবাকে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিতাম। নিজে অতি ক্লেশে, কখনও হোটেলে খাইয়া, কখন কখনও ছেলে পড়াইয়া এবং কখনও কোন বন্ধুর দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া, এক প্রকার পথে ২ বেড়াইয়া, পড়া চালাইতে লাগিলাম।

এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। যখন দ্বিতীয়

বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় মাতার মৃত্যু হয়; এবং নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় পড়িয়া হতাশ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাহাহউক, এ বিপদেও পড়া ছাড়িতে হয় নাই। এই ভাবে তিন বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এখন আরও কষ্ট। বাড়ীর অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। বাড়ীতে এক খানি মাত্র জীর্ণ কুটীর অবশিষ্ট আছে। পিতা সহস্রাধিক টাকা ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য লইলাম। হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। বিপদ ঘনীভূত হইল। চাকরীতে সুখী না হইয়া, আরও কষ্ট পাইতে লাগিলাম। কখন সনদ্বীপে, কখনও কলেরার রঙ্গ ভূমিতে, কখনও দুর্ভিক্ষ দশা-গ্রস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইয়া অশেষ প্রকারে বিড়ম্বিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে ১৮৭৮ সালে ২০৲ টাকা বেতনে জলপাইগুড়িতে সিবিল হস্পিট্যাল-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত হইলাম। নানাপ্রকার পরিশ্রম, প্রতিকূল অবস্থা, এবং ভাবনা চিন্তায় শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া গেল। এই সময় ভগবানের কৃপায় ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু প্যারীলাল ঘোষের যত্নে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। এখানে আমার ধর্ম্ম-জীবনের অঙ্কুর পরিচয় মাত্র হয়। ১৮৮১ সালে কিশোরগঞ্জ বদলী হই। এখানেও কয়েকটী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বন্ধু

আমার জীবনের সহায় হইলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তি ও প্রেমের আস্বাদ লাভ করি। ইঁহাদের ধর্ম্মভাব ও সাধুতা দেখিয়া আমার অবিশ্বাস ঘুচিয়া যায়, ও প্রাণ জাগিয়া উঠে। আমি এই সময় হইতে দৈনিক উপাসনা দ্বারা প্রাণের অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিয়া জীবন পাইলাম। এই সময় হইতে সংসারকে যেন এক নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া শুনিয়া হিন্দু সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবং নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার উৎসাহ কমিল না। ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মমত গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও কিঞ্চিৎ বাড়িল। এই সময় একটী ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ময়মনসিংহস্থ কুঠিয়াল সাহেবের লোক কর্ত্তৃক জনৈক জমীদারের পক্ষের এক জন লোক হত হয়। পরীক্ষার্থ শব আমার নিকট প্রেরিত হইল। "বিষম আঘাতেই প্রাণ হারাইয়াছে" আমার এই ধারণ হইল। সাহেবের পক্ষের লোক অন্যরূপ রিপোর্ট করিবার জন্য আমাকে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রলোভন দেখাইল। অধিক বিলম্ব করিলে পাছে মনে দুর্ব্বলতা আসে, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট লিখিয়া আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী ডাক্তার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। সাহেব

বিস্তারিত না জানিয়া আমার রিপোর্ট সত্য বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, সাহেবের পক্ষের লোক দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে, তখন আমাকে ভয় দেখাইয়া মিথ্যা রিপোর্ট দিতে আদেশ করিলেন। মহা প্রমাদ গণিয়া ভগবানের কৃপার উপর আত্ম-সমর্পন করিলাম এবং নির্ভয়ে সত্য পথই অবলম্বন করিলাম। চারিদিকেই শত্রু, অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। ডাক্তার সাহেব রাগ মিটাইবার জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না। যাঁহার কৃপায় আমি প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম, তাঁহারই আশ্চর্য্য কৃপা প্রভাবে কিছুদিন পরে উক্ত ডাক্তার সাহেব নিজের দোষের জন্য লজ্জিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সত্যের জয় হইল দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এই সময় হইতে পাপী জীবনে ভগবানের লীলা দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলাম।" রাধাচরণ হাজারীবাগ থাকা কালীন দুরন্ত রক্তকাশী রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে প্রায় বৎসরাধিক কাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে মানবলীলা সম্বরণ করেন। যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, তাঁহার জীবনে তাহা যথেষ্ট ছিল। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থা এবং বিষম পরীক্ষা সমূহে পতিত হইয়াও

তিনি নিজের সাধুতা এবং চরিত্রকে বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সকলের অনুকরণীয়। তৎকালে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ চরিত্র ও নীতিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাধাচরণ জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম এবং নীতিকে জীবনের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরীর এক স্থানে লিখিত আছে, "ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পূর্ব্বে আমি এক প্রকার নাস্তিক ছিলাম; কিন্তু তখনও নীতিকে প্রাণের সহিত পূজা করিতাম।"

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পরিবার এবং স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হন। কিন্তু রাধাচরণের চরিত্র এমনই মধুর ছিল যে, পরিবারগণ অতি সহজেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। স্থানীয় লোকেরাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। এক পল্লিতে একাই ব্রাহ্ম, একটী মাত্র ব্রাহ্ম-পরিবার, সমাজের সহানুভূতি কিছু মাত্র নাই; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও কোন প্রকার ভীত হইতে দেখা যায় নাই। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর সত্যানুরাগী ছিলেন যে, তিনি কঠিন রোগ যন্ত্রণায়

যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখনও তাঁহার সম্মুখে কেহ সত্যের অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই। তিনি শরীর খাটাইয়া সাধু উপায় দ্বারা পূর্ব্ব পিতৃ ঋণ শোধ এবং সুন্দর রূপ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও প্রায় ২০০০৲ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। পাছে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার অর্থের অসদ্ব্যবহার হয়, এজন্য উইলে সম্পত্তির এমন সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"৭। আমার লাইফ্ এসিওরেন্সের ২০০০৲ টাকা আছে, মৃত্যুর পর তাহা আনাইয়া নিম্ন লিখিত মত খরচ ও মজুত রাখিতে হইবে:—

(ক) সাহাজাদপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রী প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলে পড়িলে এক বৎসর কাল মাসিক ২৲ টাকা বৃত্তি পাইবে। ঐ বাবদ খরচ না হইলে সাহাজাদপুর নৈতিক-বিদ্যালয়ের (সময়ে এখানে নৈতিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে) উন্নতির জন্য তাহা ব্যয়িত হইবে।

(খ) সাহাজাদপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের একটী ছাত্রকে ফ্রিসিপ্ দেওয়া হইবে।

(গ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে এক কালীন ২৫্ এবং দাতব্য ফণ্ডে ২০্ টাকা দান করিতে হইবে।

(ঘ) গরিব পথিকদিগের জল-কষ্ট নিবারণ জন্য দুই স্থানে দুইটী কূপ্ খনন করিয়া দেওয়া হইবে।

১০। ঘটনা বশতঃ যদি কোন বিশিষ্ট আত্মীয় নিতান্ত বিপদে পতিত হন, তবে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়গণ উপযুক্ত বোধ করিলে সাহায্য করিবেন।

১২। ইহা বাদে যে কিছু আয় থাকিবে, তাহা পৌত্তলি-কতা-বর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিবৎসর ব্যয়িত হইবে। বলা বাহুল্য যে, কোন অবস্থাতেই এই ফণ্ডের টাকা পৌত্তলিক দেব দেবী পূজা কি তৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যেই ব্যয়িত হইতে পারিবে না। বৎসর বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু দান করিতে হইবে।

১৭। জীবিত অবস্থায় যদি দেনাগ্রস্ত না হই, তবে—র নিকট যে ৫০্ টাকা আছে, তাহা বাল-বিধবাদিগের জন্য কলিকাতায় যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আছে, তাহাতে দান করিতে হইবে। এরূপ আশ্রম না হইলে ফণ্ডে জমা থাকিবে।

১৮। এক্ষণে বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকিল, তাহাদিগের শিক্ষা শেষ হইলে, কিম্বা তাহা-

দের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে, কিম্বা দুশ্চরিত্রের জন্য পরি-বার হইতে তাড়িত হইলে, ঐ অর্থ সাহাজাদপুরের আভ্যন্ত-রিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। আভ্যন্তরিক উন্নতি—যথা, ব্রাহ্মসমাজ, ডাক্তারখানা, নৈতিক স্কুল, রাস্তা ইত্যাদি।

ভক্ত লোকের জীবনের যন্ত্রণাময় শেষ অবস্থাতেও অনেক শিক্ষার বস্তু থাকে; দেখিলে কৃতার্থ হইতে হয়। রাধাচরণ শেষ অবস্থায় পরিবারের সকলকে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন ও যে ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়। ৩রা অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার সময় তাঁহার যাত্রার দিন। তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সকলকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য বর্ণনা করে, কাহার সাধ্য? কনিষ্ঠ *সহোদরকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই—তোমার উপর এখন* গুরুতর ভার পড়িল। ভাবনা কি, ঈশ্বর সহায়। তাঁহার কৃপায় অনেক বন্ধুবান্ধবও পাইয়াছি। আমি এই পরিবারকে শান্তি-পরিবার করিয়া যাইতে পারিলাম না তাই দুঃখ হয়। মায়ের উপর নির্ভর করিয়া তুমি চেষ্টা করিতে থাক। মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

মধ্যমা বিধবা ভগ্নীকে বলিলেন, "বোন্! তোমরা হয়ত দাদাকে দেখিয়া হুজুকে পড়িয়া পবিত্র ব্রাহ্ম-মত গ্রহণ করি-

য়াছ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বড় উচ্চ ধর্ম্ম। ইহাতে জীবন চাই, উপাসনা দ্বারা জীবনকে প্রস্তুত কর, নাম সাধন কর। এক বেলা সংসারের কাজ, আর এক বেলা কেবলই উপাসনা, আত্ম-চিন্তা, পাঠ। তবেত ব্রাহ্ম হইতে পারিবে। পবিত্র ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক দিও না। দোহাই ধর্ম্মের।"

তৎপরে সহধর্ম্মিণীকে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "তুমি ত সবই জান, তোমাকে সব কথাই বলিয়াছি। ভাই বোন সকলে মিলে শান্তি-পরিবার স্থাপন কর। নিজে ভাল হইলে বালক বালিকাদিগের ভাল করিতে পারিবে। এ সমাজে ধর্ম্ম চাই, নীতি চাই, চরিত্র চাই। ব্রাহ্মের ঘরে অসৎ ছেলে হইলে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। খাও না খাও, সকলে মিলিয়া শান্তিতে মায়ের নাম করিও, তবেই সুখ।"

অবশেষে মায়ের বিশ্বাসী সন্তান এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "দয়াময়ী মা, আমি চলিলাম। আমি সংসারকে ভেঙ্গে চুরে রেখে যাইতেছি, তুমি গঠন কর। তুমি এতদিন এই অধম সন্তান দ্বারা যাহা করাইলে, তাহা ভাল কি মন্দ, তুমিই জান। কর্ত্তব্য পালন করিব, মনে কত আশা ছিল, তাহা করিতে সময় পাইলাম না। ভালই করিলে, তোমার কার্য্য তুমিই কর। আমি পাপী। রোগের যন্ত্রণা আমাকে

অস্থির করিল, আমি অবিশ্বাসী"। এই বলিয়াই—"দয়াল বল জুড়াক্ হিয়ারে—" গান ধরিলেন। ইহার পর হইতেই প্রলাপ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তেইশ দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কথায় বুঝা গেল যে, ঐ দিবস হইতেই তাঁহার আশা পরকালে বিচরণ করিতেছে।

বিশ্বাসী রাধাচরণ মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল বিষয়ে গভীর গভীর কথা বলিলেন। পরকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন, "পরকাল এখন যেন জল জলে বোধ হইতেছে ; মায়ের মধ্যে সব দেখিতেছি। আরও বলিলেন "এখন যেন আর ভাল ভাবে উপাসনা করিতে পারি না। কেবল নাম সাধন করিতেছি; তাহাও সময় সময় এলো মেলো হয়।" সেই দিন রাত্রিতে কেবলই নাম জপ করিতে থাকেন। সময় সময় উচ্চৈস্বরে প্রার্থনা করেন। কেবলই ডুবিয়া যাইবার ও সোজা রাস্তায় যাইবার কথা বলেন। অবশেষে রাধাচরণের পার্থীব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তিনি "দয়াময়" নাম জপ করিতে করিতে আনন্দ মনে দেবলোকে গমন করিলেন। ১২৯৩ সালের ২৬ শে অগ্রহায়ন শনিবার প্রত্যুষে ৩০ বৎসর বয়সে এই বিশ্বাসী আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃত ধামে যাত্রা করে।

বিদ্যুৎলতা।

সংসার উদ্যানকে সুশোভিত করিবার জন্য ভগবান কখন কখন স্বর্গের এক একটী ফুল প্রেরণ করেন। এই ফুলগুলি এখানে প্রস্ফুটিত হইয়া, আপনার সুগন্ধে জনসমাজকে মুগ্ধ করে। আবার কতকগুলি অঙ্কুরিত অবস্থাতেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া নীরবে জীবন লীলা শেষ করে। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই তাহাদের সংবাদ রাখে। বিদ্যুৎলতা এই শ্রেণীর। তাঁহার জীবন নীরবে বিকসিত হইতেছিল, এই সময় ভগবান স্বর্গের ফুল স্বর্গে তুলিয়া লইলেন।

বিদ্যুৎলতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য আজিও কতকগুলি হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিদ্যুৎলতার জন্ম হয়। বিদ্যুৎলতা বালবিধবা। বঙ্গ-গৃহে বালবিধবাকে কিরূপ অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যুৎও ঐ অবস্থার হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে তাঁহার ২।৪ জন আত্মীয় ব্রাহ্মের জীবন দর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মে। শেষে ব্রাহ্ম সমাজে আসি-

বার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই সময় তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ভগবানের কৃপায় কয়েকটী ব্রাহ্মের সাহায্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া একটী ব্রাহ্ম-পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতের জ্ঞান ও ধর্ম্ম তৃষ্ণা প্রবল ছিল, তিনি ব্রাহ্ম-পরিবারে থাকিয়া বাসনানুযায়ী জ্ঞান উপার্জ্জন ও ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন।

হৃদয়ের কোমলতা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি গুণগুলি বিদ্যুতের জীবনে এমন সুন্দররূপে বিকসিত হইয়াছিল যে, যাঁহারা একবার তাঁহার সহিত মিশিতেন তাঁহারা তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সরল ও সুকোমল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

কিন্তু বিদ্যুতের এমন সুন্দর জীবন অধিক দিন আর এ সংসারে থাকিল না। বিদ্যুৎ ভয়ানক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে বিদ্যুতের একটী ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি অন্য একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর বাটীতে যান।

সেখানে যাইয়াই হঠাৎ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইল। বিদ্যুতের আত্মীয় স্বজনগণ যথাসম্ভব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হইল। বিদ্যুতের জীবনের আশা আর রহিল না।

পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যুতের ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল; রোগ-শয্যায় সেই ভাব আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে*সর্ব্বদা কাছে বসিয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিতে বলিতেন, এবং ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। তিনি এবং তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ রোগ হইতে তাঁহার মুক্তি পাইবার আর আশা নাই। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কখন নিরাশা বা ভীতির ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। মৃত্যুর ৩ দিন পূর্ব্বে বিদ্যুতের ভগিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাকে তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয়? তাঁহাকে খবর দিব?" পরলোক-যাত্রী বিদ্যুৎ বলিলেন, "আমাকে আর সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, ভগবানের কথা বল"। শেষে যে দিন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই দিন তাঁহার যে পরলোকে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে নির্ভরের ভাব দেখা গিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেই স্বর্গীয় ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রে তাঁহার রোগের অবস্থা অনেক ভাল দেখা গেল। গভীর রাত্রে তাঁহার একটী বন্ধু

* বিদ্যুতের এই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বিদ্যুৎ আসিবার কিছুদিন পরে ব্রাহ্ম-সমাজে আসেন।

তাঁহার নিকট বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, বিদ্যুৎ তাঁহাকে বলিলেন "তুমি কাঁদ কেন, ভগবান এখানে যেমন আমাদিগকে এক করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানেও সময়ে আমরা আবার সবাই এক হইব।" আবার বলিলেন "বাবা, মাকে ছাড়িয়া তোমা-দিগকে পাইয়াছিলাম, আবার এখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া মায়ের কোলে যাইতেছি, আবার আমরা সবাই এক হইব।" ইহার পর খুব মৃদু স্বরে "এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা, পরাণ-পুতলি গো" এই গানটির কতক অংশ গাইলেন।

পর দিবসও বিদ্যুতের অবস্থা ভালই দেখা গেল। অপ-রাহ্নে তাঁহার জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইল, তিনি ভগিনীকে বলিলেন, "দিদি দেখত, আমি এখন কেমন আছি।" ভগিনী বলিলেন "তুমি খুব ভাল আছ, এখন তোমাকে কুইনাইন দিব।" বিদ্যুৎ বলিলেন "তুমি ছাই বুঝ, দাদাকে শীঘ্র ডাক।" ভগিনী গৃহ স্বামীকে (বিদ্যুৎ ইঁহাকেই দাদা বলিয়া ডাকিতেন) ডাকিলেন। তিনি আসিলে বিদ্যুৎ বলিলেন, "দাদা, আমি আজ আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" যে কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমা-

দিগকে আর কি বলিব, তোমাদিগের উপকার আমি কখনও ভুলিতে পারিব না, আজ আমাকে তোমরা বিদায় দেও।” আর একটী বন্ধুকে বলিলেন “তোমার নিকট আমি অনেক অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।” তৎপরে বিদ্যুৎ হাতজোড় করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন—“মা, তোমার এত দয়া আমি আগে জানিতাম না—তুমি আমাকে খাওইয়াছ, পরাইয়াছ, আমি তাহা ভাবি নাই। কিন্তু আজিত তোমাকে আমি দেখিতেছি, এখনত তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা। মা, তুমি আমাকে নিতে আসিয়াছ? তবে নিয়ে চল, আমি তোমার কোলে যাইব।” প্রার্থনা করিয়া বলিলেন “তোমরা গাও—“গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়।” এই রূপ ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, কাহারও মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, কেহ আর গান ধরিতে পারিলেন না। বিদ্যুৎ আবার গান গাইতে বলিলেন; এবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল। ব্রহ্মময়ী বিদ্যুৎ “জয় ব্রহ্ম জয়—” বলিয়া নিমেষের মধ্যে বিশ্ব-জননীর কোলে ঝাঁপ দিলেন। ১২৯৩ সনের ১২ই বৈশাখ অপরাহ্ন অনুমান ৪ ঘটিকার সময় বিদ্যুতের অমরাত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ ধামে গমন করে।

সপ্রকাশ।

মৃত্যু অমৃত-নিকেতনে প্রবেশের দ্বার। সংসারাসক্ত ব্যক্তি এই দ্বারে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভগবানের নাম করিতে করিতে আনন্দে ইহাতে প্রবেশ করে। সপ্রকাশ এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৭ খ্রীঃ ৩১এ অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বরাহ-নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র।

৬ বৎসর বয়সে সপ্রকাশ মাতৃ-হারা হন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় শীঘ্রই তিনি জননী-রূপা একটী সহৃদয়া মহিলার স্নেহে পালিত হইতে থাকেন। এই রমণী আমাদিগের সুপরিচিতা মিস্ কারপেণ্টার। ৮ বৎসর বয়সের সময় সপ্রকাশ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিস্ কারপেণ্টারের সহিত ইংলণ্ড গমন করেন। সপ্রকাশের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। ইংলণ্ড অবস্থান কালে তাঁহার দেহ মনের বিকাশ দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ইংরেজ-বালক বলিয়া মনে করিত। মিস্ কার্পেণ্টার ইঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাঁহার

বাসনা ছিল, ইঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার সুবন্দোবস্ত ও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। দুই বৎসর গত হইতে না হইতেই জননী-স্বরূপিনী মিস্ কার্পেণ্টার বালকদ্বয়কে একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সপ্রকাশকে অগ্রজের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ইংলণ্ডে যাইয়া সপ্রকাশ ইংরাজী ভাষা সুন্দর রূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেশে আসিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সিলং যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে ও তাঁহাব স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ দিন উপস্থিত হইল। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট ১৮ বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজনকে দুঃখের পাথারে নিক্ষেপ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

স্নেহ, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি অতি শৈশব কালেই তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কিছু অর্থ ছিল। স্বাভাবিক দয়া ও সাধুভাব দ্বারা চালিত

হইয়া তাহার কতক অংশ তাঁহার গরিব আত্মীয় স্বজনকে এবং কতক অংশ সাধারণব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য দান করিয়া যান।

তাঁহার স্বভাব অতি কোমল ছিল। অতি অল্প সময়ে লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিত। কিন্তু এই কোমল ভাব তাঁহার প্রকৃতিতে কখনও ভীরুতা আনয়ন করে নাই। বরং তিনি অনেক সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন।

রোগ-শয্যায় তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব দেখা গিয়াছিল। প্রায় বৎসরাধিক কাল তিনি কঠিন জ্বর-রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁহাকে অসহিষ্ণু হইতে দেখা যায় নাই। সপ্রকাশ নিজে অতি মধুর সঙ্গীত করিতে পারিতেন। অনেক সময় সাধারণব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে তিনি সময়োপযোগী নানা সঙ্গীত করিতেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অতি শুষ্ক প্রাণেও আনন্দের সঞ্চার হইত। এই সঙ্গীত তাঁহার রোগ-শয্যায় সম্বল ছিল। তিনি রোগ-যন্ত্রণার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভাবের সহিত "শেষের সেদিন মন, করেরে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে", "কি ভয় ভাবনারে মন লয়েছ যাঁর আশ্রয়, সর্ব্ব-শক্তিমান তিনি অনন্ত করুণায়" এবং "দয়াল বল যুড়াক হিয়ারে" এই সঙ্গীতগুলি করিতেন। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গাইতে বলিতেন। তাঁহার

শয্যা-পার্শ্বে সর্ব্বদা এক খানা ব্রহ্ম-সঙ্গীত বই থাকিত। তাহার উপরে লেখা ছিল—"Treasury of consolations"

তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পার্থিব জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কখনও ভয়ের ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। বরং রোগ-শয্যায় তাঁহার বিশেষ নির্ভরশীলতার ভাবই দেখা গিয়াছে। তিনি সিলং হইতে তাঁহার পিতাকে এই চিঠি খানা লেখেন—"বাবা, প্রায় দুই মাস হইল আমি তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়াএখানে আসিয়াছি। কিন্তু আমার পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার মনে হয় যে, সেই বিদায়ই আমার শেষ বিদায় গ্রহণ হইয়াছে। যেখানে আমাদের বন্ধু বান্ধবগণ গিয়াছেন সম্ভবতঃ সেই পরলোকেই আবার তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

সপ্রকাশের পরলোক গমনের দিন যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই দিন চিরস্মরণীয়। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও কি প্রকারে ভগবানের বিশ্বাসী সন্তান তাঁহার নাম করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তাঁহারা সেই দিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই দিন সপ্রকাশের রোগ-যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। কিন্তু তিনি অধীর হইলেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "গাও—

"দয়ার সাগর পিতা করুণা নিধান।" ভ্রাতা সঙ্গীত করিলেন। ইহার পর তাঁহার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "বাবা, আমি আর কত সহ্য করিব, আরত পারিনা।" তাঁহার পিতা তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন "সপ্রকাশ, এখন কি তুমি তোমার দয়াল পিতার নাম ভুলিলে, মনে মনে সেই পবিত্র নাম স্মরণ কর; তোমার প্রাণ-স্পর্শী প্রার্থনাতে এবং মধুর সঙ্গীতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে; একবার সেই শান্তি-ময়ের মধুর নাম কর।" এই কথা গুলি শুনিবামাত্র সপ্রকাশ চক্ষুরুন্মিলন করিলেন এবং হাত দুখানি বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, "দয়াময় দীন-বন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই কথা বলিতে বলিতে বিশ্বাসীর আত্মা সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ ধামে গমন করিল। মাটির শরীর মাটিতে পড়িয়া রহিল।

ফণীন্দ্রনাথ।

ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি সংসার-উদ্যানের এক একটী ফুল। স্বভাবতঃই ইহারা সুন্দর। আবার যখন ইহারা ইহাদের অল্প সময়ের জীবনেও ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া যায়, তখন ইহাদের জীবন আরও সুন্দর হয়, লোকে তাহা স্মরণ করিয়া পবিত্র হয়। ফণীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর একটী ফুল। ফণীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৪ বৎসর বয়সে আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া পরলোক গমন করেন।

ফণীন্দ্রনাথের বুদ্ধি-শক্তি প্রশংসনীয় ছিল। কঠিন বিষয় সহজে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সমবয়স্ক বালকেরা যে সকল বিষয় সহজে ধারণা করিতে পারিত না, তিনি তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেন। তিনি প্রাপ্ত-বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের সঙ্গে থাকিয়া উচ্চতর বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেন। সেই জন্য অনেক সময় দেখা যাইত যে, তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সহবাস পরিত্যাগ

করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট বসিয়া সৎকথা শ্রবণ করিতেন।

তাঁহার হৃদয় কোমল ও প্রশস্ত ছিল। স্নেহ, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব সকল সুন্দর রূপে বিকশিত হইয়াছিল। দুঃখীদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় দয়া ছিল। সময়ে সময়ে নানা প্রকারে তাহা প্রকাশ পাইত। তাঁহার পিতা মাতার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। সাধু ও মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইত। কোন সাধু ব্যক্তি তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলে তিনি আনন্দ পাইতেন ও যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিতেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতেন—"আমি এমন হতভাগা যে, এমন কেশববাবুকে আমি দেখিতে পাইলাম না।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য তাঁহার বড় আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সেই জন্য তাঁহার পিতার সহিত চুঁচড়ায় মহর্ষির বাসায় গিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। মহর্ষি তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ছিলেন ও তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। জীবের প্রতি দয়া বশতঃ তিনি ১০ বৎসর বয়সেই নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন। তৎপর চিরদিনই নিরামিষ ভোজন করিয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদের বাড়ীতে

কোন ভৃত্য থাকিত না ; সুতরাং তাঁহাকে বাজার করিতে হইত। মৎস্য ক্রয় করিবার পয়সা দিলে বলিতেন "মৎস্য যখন আহার করা অন্যায়, তখন ক্রয় করাও অন্যায়।" এই বলিয়া পয়সা ফিরাইয়া দিতেন। বিশেষ করিয়া মৎস্য কিনি-বার অনুরোধ করিলে বলিতেন "যদি পিতার কোন কঠিন পীড়া হয়, এবং চিকিৎসক মৎস্য খাইতে বলেন, তখন মৎস্য ক্রয় করিতে পারি।"

তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও নৈতিক জ্ঞান উজ্জ্বল ছিল। কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। নীতি-বিরুদ্ধ ও কুৎসিৎ বিষয়ের প্রতি প্রবল ঘৃণা ছিল। তিনি যখন কোন্নগরের স্কুলে পড়িতেন, তখন দেখা যাইত যে, বিশ্রামের জন্য ছাত্র-দের যে অর্দ্ধ ঘণ্টা ছুটী হইত, সেই সময় তিনি স্কুলে না থাকিয়া তাঁহাদের বাসায় চলিয়া যাইতেন। এক দিবস গ্রীষ্মকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন যে "এত রৌদ্রে বাড়ী আসি-বার প্রয়োজন কি ? স্কুলে থাকিলেই হয়।" ফণীন্দ্র উত্তর করিলেন, "ছুটির সময় ছেলেরা এত অশ্লীল কথা বলে যে, তাহাতে আমার নরক বোধ হয়, সেই জন্য আমি বাড়ী চলিয়া আসি।"

তাঁহার অল্প বয়সেই যেরূপ ধর্ম্ম ভাব দেখা গিয়াছিল, সচরাচর বালকদিগের এরূপ হয় না। ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি

সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। তাহাতে কবিত্ব শক্তি ও ভগবদ্ভক্তি উভয়ই আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি পিতা মাতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিয়া অনেক সময় ব্রহ্ম-সঙ্গীত গান করিতেন। গান করিতে করিতে তিনি ভাবে মোহিত হইতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষে অশ্রু বিন্দু লক্ষিত হইত। উপাসনা তাঁহার বড় ভাল লাগিত। ব্রহ্মোৎসবে বড় আনন্দ পাইতেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রাণভরিয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ করিতেন। মাঘোৎসবের সময় গাঁদা ফুল দিয়া মন্দির সাজান হয়, সেই জন্য তিনি যখনই গাঁদাফুল দেখিতেন, ইহার ঘ্রাণ লইয়া বলিতেন "ইহাতে মাঘোৎসবের গন্ধ রহিয়াছে।" মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনও তাঁহার পিতৃদত্ত দুইটী গাঁদাফুলের ঘ্রাণ লইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

জ্বর ও রক্তামাশয় রোগে অনেক কষ্ট পাইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু শয্যায় বিশেষরূপে তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুহইবে। সেই জন্য তিনি কিছু মাত্র ভীত হন নাই। মৃত্যুর দিন তিনি পিতা মাতার নিকট রীতিমত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতা মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া

পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পিতার মুখচুম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। গাঢ় ভালবাসার সহিত চুম্বন করিলেন। তাঁহার পিতা শীঘ্র মুখ তুলিয়া লওয়াতে তিনি বলিলেন "মনের দুঃখ থাকিয়া গেল, ভাল করিয়া চুম্বন করা হইল না।" তখন তাঁহার পিতা আবার মুখের কাছে মুখ দিলেন। ফণীন্দ্রনাথ প্রাণভরিয়া মুখচুম্বন করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। মাতারও মুখ চুম্বন করিলেন। তাঁহার মাতা কাঁদিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন "আর কাঁদিলে কি হইবে, এখন ঈশ্বরকে ডাক।" ইহার পর তিনি যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, তাঁহার পিতা মাতার প্রতি অত্যন্ত যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, তখন তিনি তাঁহার মাতাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন "আমি বেশ আছি, তুমি গিয়া স্নানাহার কর, বাবাকে খাইতে দেও।" ইহার অল্প সময় পরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

লালমোহন।

সংসার-উদ্যানে কত ফুল ফুটে, কত ফুল সুগন্ধ বিস্তার করে; লোকে সৌরভে আমোদিত হইয়া তাহাদিগকে কত আদর করে, কত যত্ন করে; কিন্তু আবার কত ফুল পূর্ণ বিকাশ হইতে না হইতেই আপনার সুবাসে ক্ষণেকের জন্য চতুর্দ্দিকস্থ জনগণকে মুগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। অধিকাংশ লোকেই তাহা জানিতে পারে না। স্বর্গীয় লালমোহন এই শ্রেণীর। তাঁহার জীবন নীরবে একটী ক্ষুদ্র পরিবারে বিকাশ হইতে ছিল; সবে মাত্র তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এই সময় ভগবান তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেত্‌কা গ্রামে একটী ঘোষাল-পরিবারে লালমোহনের জন্ম হয়। অনেক দিন হইতে এই পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রবেশ করে। লালমোহনের যখন ১৫। ১৬ বৎসর বয়স, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই সময় তিনি প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে তাঁহার এক খুল্লতাতের গৃহে থাকিয়া

একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। এখানে তিনি সমপাঠিদিগের সহিত পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই সময় তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে পূর্ব্বপাড়াতে একটি প্রার্থনা-সভা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান পূর্ব্বপাড়া ব্রাহ্মসমাজ সেই সভারই বিকাশ। লালমোহনের খুল্লতাত একজন গোঁড়া হিন্দু, যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর যজমান ছিল, তাহাদের বাটী অনুষ্ঠানাদির সময় তিনি একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত শালগ্রাম লইয়া যাইতেন, আর নিজ বাড়ীতে প্রস্তরের শালগ্রাম পূজা করিতেন। ঘটনাক্রমে লালমোহন কর্ত্তৃক এ রহস্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় লালমোহন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সমাজের নিকট অনেক গ্লানি সহ্য করিতে হয়।

লালমোহন প্রতি শনিবার বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবার বজ্রযোগিনী প্রত্যাগত হইতেন। বাড়ীতে এই দুই দিন উৎসাহের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিতেন। তাঁহাদের পরিবার ব্রাহ্ম হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎসাহিত, মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সময় তাঁহার যে ধর্ম্মোৎসাহ ও অনুরাগ দেখা গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আনন্দ হয়।

ইহার কিছু দিন পরে ভগবানের কৃপায় ঘোষাল-পরিবারের সকলে ক্রমে ২ ব্রাহ্ম সমাজে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দেন, এবং কলিকাতা আসিয়া বাস করেন। লালমোহন কিছু দিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে ক্যাম্বেল্ মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে যান। কলিকাতা আসা অবধিই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে থাকে; শেষে স্ক্রফুলা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারি মাস শয্যাগত থাকিয়া গত ২০এ ডিসেম্বর (১৮৯০ সন) শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অমৃত ধামে যাত্রা করিয়াছেন।

এই দারুণ রোগ-যন্ত্রণার সময় তাঁহার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখা যাইত। তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এবার আর তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এজন্য কখনও তাঁহাকে নিরাশার ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। এক দিন তাঁহার বৃদ্ধা জননী তাঁহার শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে ছিলেন; লাল মোহন তাঁহাকে বলিলেন "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় যে আমি বাঁচিব, তবে ত কোন কথাই নাই, আর যদি তাঁহার ইচ্ছা অন্য রূপ হয়, তাহাতেই বা ভয় কি, কে চিরদিন থাকিতে আসিয়াছে? তুমি প্রার্থনা কর যে, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" আর এক-দিন তাঁহার এক ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রোগে অনেক দিন কষ্ট পাইতেছ বলিয়া কি তোমার ভয় হয়?" তিনি বলি-

লেন "না, আমিত সে সম্বন্ধে কিছু ভাবিনা।" আর একদিন একজন ব্রাহ্ম বন্ধু বলিলেন "তোমার ব্যারাম বড় শক্ত, ইহার ঔষধ নাই, তুমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর" লালমোহন বলিলেন, "তাহার জন্য আমি চিন্তা করি না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই হইবে।" এই সময় তিনি তাঁহার একটি স্নেহের ভগিনীকে এই চিঠি খানা লেখেন—"আজ তোমার চিঠি খানা পাইয়া বড় সুখী হইলাম। * * * * "আমি মবিব" যখন এই কথাটি চিন্তা করি, একটুক ও কষ্ট হয় না; কিন্তু যখন ভাবি, আমি আরও এক বৎসর ব্যারামে ভুগিব, তখনই আমাকে অস্থিব করিয়া ফেলে, নিরাশায় মন আচ্ছন্ন হয়। মৃত্যুত অতি সহজ, তাহাতে আবার ভয় কি? কিন্তু বোগ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তুমি একথা কখনও মনে স্থান দিও না যে, আমি মৃত্যুর জন্য চিন্তা করিয়া থাকি। * * * * শুইয়া শুইয়া আর লেখা যায় না।"

লালমোহন দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও যখন একটু সুস্থতা লাভ করিতেন, তখন প্রার্থনা করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রসন্নচিত্ত দেখা যাইত। তাঁহার রোগ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভগবানে নির্ভরতা ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার যতক্ষণ চেতনা ছিল, বুকের উপর হাত রাখিয়া প্রার্থনার ভাবে ছিলেন।

একদিন তিনি একটি সুগায়িকা ব্রাহ্মিকা ভগিনীর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আসিয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী করেন—

"জানি তুমি মঙ্গলময়,
জানি তুমি মঙ্গলময় হে—
প্রতি পলকে পাই পরিচয়,
সুখে রাখ দুঃখে রাখ যে বিধান হয়—
কিছুতেই নাহি ভয়।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবেনা কভু,
এই মম ভরসা—এস প্রভু, এস প্রভু,
হৃদয় মাঝে—হবে শুভ নিশ্চয়॥"

যতক্ষণ না সঙ্গীতটি শেষ হইল, বুকের উপর হাত রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। গান শেষ হইল, কিন্তু একবার শুনিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না, আবার গাইতে বলিলেন; গানটী গাওয়া হইল।

লালমোহনের গৃহে একখানা প্রার্থনাশীল বালিকার ছবি ছিল। তিনি সেই ছবি খানা তাঁহার সম্মুখের দিকের দেওয়ালে রাখিতে বলেন। পরে উহা সেইরূপ রাখা হইলে, অনেক সময় বুকের উপর দুখানি হাত রাখিয়া উহার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায়

যে ঈশ্বর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনুকরণীয়।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় আবার ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনিবার জন্য উক্ত ভগিনীকে ডাকিতে বলিলেন। ভগিনী আসিলে লালমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হইল "কোন গান গাওয়া হইবে?" তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন "জানি তুমি মঙ্গলময়।" সঙ্গীত শেষ হইলে বলিলেন "বড় ভাল লাগিয়াছে, আর একটি।"

ইহার পর হইতে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিল, কিন্তু চেতনা বেশ রহিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সময় আর নাই; তাই আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন "আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তোমরা সাবধান থাকিবে।" ইতিমধ্যে একবার তিনি অচেতন হন। তাঁহার আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার চেতনা হইল। তিনি বলিলেন "একি, তোমরা কাঁদিতেছ কেন, 'আমার মরিতে একটুও আপত্তি নাই। মরিতে ভয় কি?" তাঁহার অগ্রজ বলিলেন "ভাই, এই সময় ভগবানের নাম বড় ভাল, তাঁহার নাম তোমার স্মরণ আছে? বল ত 'দয়াময়'।" তিনি বলিলেন "আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, আমি ঠিক আছি, আপ-

নারা ভীত হইবেন না।” আবার বলিলেন “আমার বোধ হইতেছে আমি যেন আমাতে নাই।”

অতঃপর লালমোহন নিকটস্থ অগ্রজ ও শুশ্রূষাকারিণী এক জন আত্মীয়াকে ক্ষীণ, শুষ্ক বাহু দুইখানা প্রসারণ করিয়া বিদায়-সূচক আলিঙ্গন করিলেন। এই তাঁহার শেষ বিদায়। ইহার পর ২।১ টী ভিন্ন আর অধিক কথা বলিতে পারেন নাই।

রোগীর শুশ্রূষা করা লালমোহনের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এক সময় নিয়মিতরূপে মেডিক্যাল কলেজ-হসপিটালে যাইয়া রাত্রিতে নিরাশ্রয় রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার এই ভয়ানক রোগ হওয়ার প্রারম্ভে ও অসুস্থ শরীর নিয়া একটী পীড়িত বালকের নিকট কখনও কখনও অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতেন। তিনি অনেক সৎকার্য্যেই উৎসাহের সহিত যোগ দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার কোন বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি রোগীর সেবা করিতেন, কিন্তু তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না।

তাঁহার হৃদয় অতি বিনীত, নিস্বার্থপর এবং স্বভাব অতি মধুর ছিল। যাহার সহিত একবার মিশিতেন, তাহার সহিতই তাঁহার সদ্ভাব জন্মিত। অন্যের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এই বিনীত ভাবের সহিত সৎসাহস

মিশিয়া তাঁহার চরিত্রকে আরও সুন্দর করিয়াছিল। একদিন একজন বলিষ্ঠ ইংরেজ বিনা কারণে একজন দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে প্রহার করিতেছিল। লালমোহন ইহা দেখিতে পাইয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সাহেবের হস্ত হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিলেন। এই উপলক্ষে সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মল্ল যুদ্ধ হইয়া গেল।

লালমোহনের ধর্ম্মানুরাগ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি রুগ্ন শরীর নিয়া ও ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি ছাত্রদিগের প্রার্থনা সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও সভ্য হইয়াছিলেন।

লালমোহনের চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল ; তিনি বিশ্ব-মাতার বিশ্বাসী সন্তান ছিলেন ; জননী তাঁহাকে স্বীয় অমৃত-ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যু-শয্যায় যে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ভগবান করুন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার দিকে অগ্রসর হই।

পরলোক।

পরলোক, সংসার-রজনীর প্রভাত কাল। মৃত্যু তাহার গোধূলি সময়—আরক্তিম ঊষা। সংসার, অন্ধকারময় কারাগৃহ; পরলোক, আলোকময় কার্য্যক্ষেত্র। মানবাত্মা ইহলোকে স্বপন দেখে, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বুঝে সবই মিথ্যা। স্বপন কি কখন সত্য হয়? স্বপনে যাহারা কাঁদিয়াছে, জাগিয়া দেখে তাহাদের আঁখিতে আর জল নাই। মোহ-ঘুমে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যাহারা নিরাশার স্বপন দেখিয়াছে, প্রভাতে জাগিয়া দেখে যে, নব নব আশার অঙ্কুর তাহাদের হৃদয়ে ফুটিতেছে।

সংসার দুদিনের জন্য। বাটী যাইতেছি; সন্ধ্যা আসিল, তাই সংসারে এক রাত্রের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

সময়, সহচর। সে সাথে করিয়া আনিয়াছে, তাহারই হাত ধরিয়া মৃত্যু-নদীর ইহ-পার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

মৃত্যু-নদীর পর পারে সময় তাহার ধ্বংসকারী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, মৃত্যু-নদীর সংসার-উপকূল হইতে স্বয়ং বিশ্ব-জননী হাত বাড়াইয়া সংসার-দগ্ধ মানব আত্মাকে

কোলে তুলিয়া লয়েন; জ্যোতির্ম্ময় হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ও তাহার মুখ চুম্বন করেন। সেখানে কত আনন্দ, কত সুখ, কত শান্তি। মানবাত্মা সে সুখ, সে আনন্দ সহ্য করিতে পারে না।

পরলোক আনন্দময়, শান্তিময়, আলোকময়। মানবাত্মা সেখানে চির আনন্দ, চিরশান্তি ও চির আলোক ভোগ করে। সংসারের শোক তাপ সেখানে নাই। শোক মরিয়া সেখানে সুখ হইয়া যায়, অজ্ঞানতা মরিয়া সেখানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। সংসারের অশান্তি মরিয়া সেখানে শান্তি দিতে যায়, অন্ধকার মরিয়া সেখানে আলোক দেখায়। বিচ্ছেদ সেখানে আত্মায় আত্মায় মিলন করিতে যায়। সেখানে অযুত তপন মধুর আলোক দান করে, কুসুমে কুসুমে চারিদিক সজ্জিত, অমৃতের নদী দশ দিক প্রবাহিত।

পরলোক অনন্ত উন্নতির স্থান; মানবাত্মা অনন্তকাল ধরিয়া সেখানে বিচরণ করে। বিশ্ব-জননীর জ্ঞান-কণা লাভ করিয়া অনন্ত জ্ঞানের পথে ধাবিত হয়। সে জ্ঞানের, সে উন্নতির পথে বাধা দেয় সাধ্য কার? সূর্য্যকে আবেষ্টন করিয়া সৌর-জগত যেরূপ অনন্ত কাল তাহার চারিপাশে পরিভ্রমণ করে ও আলোক প্রাপ্ত হয়, জগত-জননীকেও সেইরূপ মধ্য বিন্দু করিয়া মানবাত্মা তাঁহার চারিদিক প্রদ-

ক্ষিণ করে ও তাঁহা হইতে জ্ঞান ও প্রেম লাভ করে। সৌর-জগতের মাধ্যাকর্ষণ সেখানে নাই; সেখানে সুধু প্রেমের আকর্ষণ—হৃদয়ের আকর্ষণ। সেখানে কত প্রেম, কত স্নেহ। সেই জ্ঞানের রাজ্যে, সেই প্রেমের রাজ্যে, সেই সুখের রাজ্যে কে যাইবে এস। স্নেহময়ী জননী প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া ডাকিতেছেন, শোকে তাপে হৃদয় জ্বলিতেছে যাহার—সে এস, হৃদয় জুড়াইবে, সুধা পান করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে।

অমৃত-কোলে।

অনন্ত বিমান উজলি বিভায়
দেব-শিশুকুল ডাকিছে মোরে,
অশ্রুমাখা চুম কপোলে লইয়া
উল্লাসে চলিনু পিতার ঘরে।
ধরার মমতা স্নেহ ভালবাসা
আকুল নয়ানে রহিনু চাহি;
দিগন্ত প্রসার মরণ-সাগরে
জীবন-তরণী চলিনু বাহি।
নিমেষে শুনিনু, সুর-লোক হ'তে
উথলি সঙ্গীত আসিছে ধীরে,
সুতানে তাহার ভরে গেল প্রাণ
আরও আবেগে ছুটিনু তীরে;
দেখিনু সেথায় জ্যোতির বসনা
অমর অমরী দাঁড়ায়ে আছে,
মহান্ উদার ফুটন্ত হৃদয়ে
আলিঙ্গি আমায় লইতে কাছে;
উতরিনু তীরে, সস্নেহে চুমিলা
স্বরগের যত ভগিনী ভাই,
অমৃতের কোলে নবালোকে শেষে
চিরতরে আমি লভিনু ঠাঁই!